বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খ- ২৯ বার্ষিক সংখ্যা ১৪১৮

খাদ্য মূল্যস্ফীতি এবং এর প্রভাব : একটি পর্যালোচনা

মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন*
বদর-ন নেছা আহ্মেদ

১। ভূমিকা

নব্বইয়ের দশকের পর থেকে দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানকারী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা হ্রাস পেয়ে বর্তমানে দারিদ্র্যের হার ৩১.৫ শতাংশ (২০১০ সালের পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয়-ব্যয় জরিপ[১] এর প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী) হয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাসের এই হার যদি চলমান থাকে তবে ২০১৫ সালো মধ্যেই এ বিষয়ে সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা (দারিদ্র্যের হার ২৯.০ শতাংশ বা ১৯৯০ সালের তুলনায় অর্ধেকে নামিয়ে আনা) বাংলাদেশ পূরণ করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। তবে এক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সময়ে বড় বাধা হয়ে দেখা দিয়েছে উচ্চ হারে মূল্যস্ফীতি, যা এক অংকের সীমা অতিক্রম করে দুই অংকে পৌঁছেছে। খাদ্য মূল্যস্ফীতির ফলে সামষ্টিক অর্থনীতি এবং বিভিন্ন রূপ খানা কিভাবে প্রভাবিত হচ্ছে তা জানা প্রয়োজন কারণ সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা, খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ড় নীতিমালা প্রণয়নে জন্য এ বিষয়টি খুবই গুর-ত্বপূর্ণ।

সাধারণভাবে ধারণা করা হয়ে থাকে যে, মূল্য বৃদ্ধির ফলে গ্রাম এবং শহরে কৃষিবহির্ভূত কর্মকা-ে নিয়োজিত পরিবারগুলো ক্ষতিগ্রস্ড় হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এবং যেহেতু দরিদ্র পরিবারগুলো আনুপাতিক হারে খাদ্য-ব্যয় বেশি করে, তাই তাদের উপরও নেতিবাচক প্রভাব বেশি হতে পারে। অন্যদিকে ধারণা করা হয় যে, কৃষি কাজে নিয়োজিত পরিবারগুলো খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে লাভবান হন, যেহেতু তাদের প্রধান আয়ের উৎস হচ্ছে কৃষিপণ্য বিক্রয়। তাই এই অনুমিতিটি যাচাই করা প্রয়োজন যে, কৃষিনির্ভরশীল পরিবারগুলো খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে কি পরিমাণ লাভবান হয় এবং কৃষিবহির্ভূত খানাগুলো ক্ষতির সম্মুখীন হয় কিনা। বর্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হলো খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে তা সামষ্টিক অর্থনীতি বিশেষত দরিদ্রের উপর কি প্রভাব রাখে তা পর্যালোচনা করা এবং সেই সাথে নানারূপ খানা যেমন: ভোক্তা ও উৎপাদনকারী, নিম্ন আয়ের কর্মজীবীরা কিভাবে প্রভাবিত হন তা বিশেণ্ডষণ করা। খানাপর্যায়ে খাদ্য মূল্যস্ফীতির প্রভাব আলোচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণির খানার ভোগব্যয় ও তাদের উৎপাদনের তথ্য ২০০৫ ও ২০১০ এর পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয়-ব্যয় জরিপ (HIES) থেকে নেওয়া করা হয়েছে। তাছাড়া নিম্ন আয়ের কর্মজীবী যেমন রিক্সাচালক ও নির্মাণ-শ্রমিকদের ভোগব্যয় ও আয়ের তথ্য মাঠ জরিপের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে।

---

* লেখকদ্বয় বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) এর রিসার্চ এসোসিয়েট। মূল্যবান মতামত দিয়ে প্রবন্ধটির মান উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য লেখকদ্বয় জনৈক রেফারি এবং বিআইডিএস -এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. নাজনীন আহমেদের কাছে কৃতজ্ঞ।

[১] Household Income and Expenditure Survey (HIES)।

মোট আটটি অংশের মধ্যে প্রবন্ধটির আলোচনা সীমাবদ্ধ রয়েছে। প্রথম অংশে ভূমিকার পর দ্বিতীয় অংশে সাম্প্রতিক সময়ে খাদ্যমূল্যের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গতিধারা উলেণ্ডখ করা হয়েছে এবং এর প্রধান কারণসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবৃদ্ধির এবং দরিদ্র খানার উপর খাদ্যমূল্যের প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে প্রবন্ধটির তৃতীয় ও চতুর্থ অংশে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অংশে উৎপাদনকারী ও ভোক্তা খানার উপর খাদ্যমূল্যস্ফীতির প্রভাবের ভিন্নতা এবং খাদ্যমূল্যস্ফীতি ও মজুরির হারের স্থিতিস্থাপকতা আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী অংশে খাদ্য মূল্যস্ফীতির নিয়ন্ত্রণ এবং এর নেতিবাচক প্রভাব নিম্পর্যায়ে রাখার উদ্দেশ্যে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ আলোচিত হয়েছে এবং সবশেষ অংশে এ লক্ষে স্বল্পমেয়াদি ও মধ্যম মেয়াদি সুপারিশমালাসহ উপসংহার টানা হয়েছে।

২। সাম্প্রতিককালে খাদ্যমূল্যের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গতিধারা

২০০৭-০৮ সময় থেকে শুর" হওয়া খাদ্যমূল্যস্ফীতি বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতি এবং বিভিন্নরূপ খানার পরিবারগুলোকে কিভাবে প্রভাবিত করছে তা আলোচনা করার পূর্বে এ সময়কালে খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির কারণগুলো জানা দরকার। বর্তমান প্রবন্ধের এ অংশে সে প্রচেষ্টাই করা হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রধান নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলো হচ্ছে, চাল, আটা, ভোজ্য-তেল, এবং ডাল; যার মধ্যে চাল প্রধান খাদ্যদ্রব্য। ২০১০ সালের আগস্ট-অক্টোবরের তথ্য বিশেণ্ডষণে দেখা যায় যে, এই তিন মাসে মোটা চালের গড় খুচরা মূল্যের পরিবর্তন ছিল পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক গড় দামের চেয়ে ১২ শতাংশ বেশি। ২০০৭ এবং ২০০৯ সালেও দামের ঊর্ধ্বগতির এই ধারা লক্ষণীয় ছিল, যা আটার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে আরেকটু পেছনে তাকালে দেখা যায় যে, ২০০৪-০৬ সময়ে চালের ও আটার দামের পরিবর্তন ছিল যথাক্রমে ৮৬ শতাংশ ও ৩২ শতাংশ। টিসিবি'র তথ্য মতে, ২০১১ সালের জানুয়ারিতে মোটা চালের বাজার দাম কেজি প্রতি ৩৪ টাকা থেকে ৩৬ টাকার মধ্যে উঠা-নামা করে। এক বছর পূর্বেও এই দাম ২৬-২৭ টাকার মধ্যে ছিল; অর্থাৎ এক বছরে চালের দাম ৩২.০৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। টিসিবি'র মতে, একই সময়ে গমের দাম বৃদ্ধি পায় ৪৮.৪৯ শতাংশ । চাল ও গমের এই দাম বৃদ্ধি অন্যান্য ভোগ্য পণ্যের দাম বৃদ্ধিতেও প্রভাব ফেলেছে।

সারণি ১

খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র (পূর্ববর্তী তিন মাসের তুলনায় ত্রৈমাসিক শতকরা পরিবর্তন)

খাদ্য দ্রব্য	সময় মেয়াদ	পূর্ববর্তী তিন মাসের তুলনায় ত্রৈমাসিক শতকরা পরিবর্তন				২০০৪-০৬-এ শতকরা পরিবর্তন
		২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	
মোটা চাল	আগস্ট-অক্টোবর	↑(১২)	↑↑(৫২)	↔ (-২)	↑↑ (৩০)	↑↑↑↑(৮৬)
আটা	আগস্ট-অক্টোবর	↑↑(২১)	↑↑(৩৬)	↓↓ (-২৬)	↔ (-৮)	↑↑ (৩২)
পামওয়েল	আগস্ট-অক্টোবর	↑(১২)	↑(১৯)	↔ (১)	↓ (-১৮)	↑↑↑ (৫৬)
ডাল	আগস্ট-অক্টোবর	↔ (-১)	↓ (-১৭)	↓↓ (-২২)	↑ (১৩)	↑↑↑ (৬০)

নোট: ↑= বৃদ্ধি, ↓= হ্রাস, ↔ = অপরিবর্তিত এবং ↑↑, ↑↑↑ = পরিবর্তনের মাত্রা । তথ্য সূএ: কৃষি বিপণন বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়।

Dorosh (2011)-এর মতে, ১৯৯৭-২০০৬ সময়কালে ঢাকার পাইকারি বাজারে মোটা চালের মূল্য স্থিতিশীল ছিল। কিন্তু ২০০৭ সালের পর থেকে এই চালের বাজার খুবই অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। ২০০৬ সাল পর্যন্ড় যেখানে মোটা চালের কেজিপ্রতি পাইকারি মূল্য ছিল ১৫-১৭ টাকা, তা ২০০৮ সালে ৩২

টাকা পর্যন্ড় পৌঁছায়। ২০০৯ সালে এসে চালের মূল্য বেশ খানিকটা কমে আসে, কিন্তু এই ধারা স্থায়ী হয়নি। ২০১০ সালের শুর“ থেকে চালের বাজার আবার উর্ধ্বমুখী হতে থাকে।

২০০৭ সালে দুটো মৌসুমী বন্যা (যথাক্রমে জুলাই এবং সেপ্টেম্বর) এবং ঘূর্ণিঝড় সিডর (নভেম্বর ২০০৭) আউশ এবং আমন ধান উৎপাদনে যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে। আমন ধানের জন্য এই ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় ১.৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন। এর প্রভাবে চালের যোগানের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ২০০৭ সালের শেষ চার মাসে আন্ড়র্জাতিক বাজারে চালের মূল্য বৃদ্ধিও দেশীয় চালের বাজারে প্রভাব ফেলে। পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে যখন বেশক'টি চাল রপ্তানিকারক দেশ চালের রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। বাংলাদেশে চাল আমদানির প্রাথমিক উৎসই হচ্ছে ভারত। কিন্তু ভারত তার চাল রপ্তানির সর্বনিম্ন মূল্য প্রতি মে. টন ৪২৫ ডলার (অক্টোবর ২০০৭) থেকে বৃদ্ধি করে ৫০৫ ডলারে (ডিসেম্বর ২০০৭) উন্নীত করে । মার্চ ২০০৮ এ ভারত সরকার চাল রপ্তানির উপর নতুন নিষেধাজ্ঞা জারী করে এবং চালের রপ্তানি মূল্য প্রতি মে. টন ৬৫০ ডলারে উন্নীত করে। এক সপ্তাহের পর এই সর্বনিম্ন দাম বেড়ে প্রতি মে. টন ১০০০ ডলারে পৌঁছায়। ২০০৮ সালের শুর“তে থাইল্যা“ও চালের রপ্তানিমূল্য বাড়তে থাকে। এসবের প্রভাবে বাংলাদেশে চালের দাম বেড়ে ২০০৮ এ প্রতি কেজি ৩৬ টাকা বা প্রায় ০.৫৫ ডলার হয় (Department of Agricultural Marketing -এর তথ্য অনুযায়ী)।

চিত্র ১

আন্ড়র্জাতিক এবং দেশীয় বাজারের চালের পাইকারী মূল্য, ২০০৮-১১

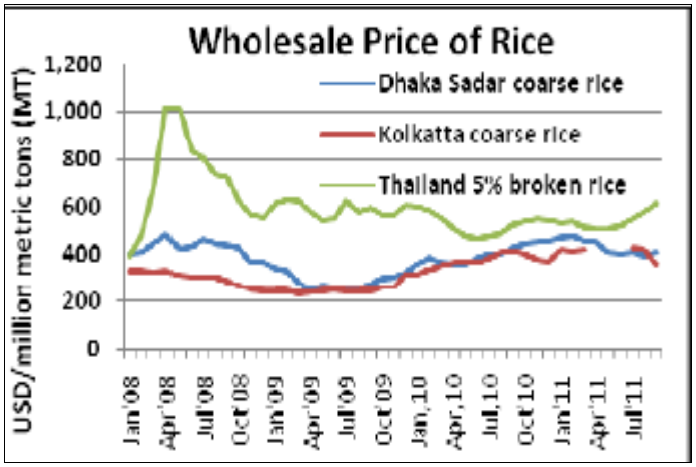

উৎস: Bangladesh-DAM; Thailand-Index Mundi; Kolkata-Dept. of Consumer Affairs, India।

শীর্ষ গম উৎপাদনকারী দেশ রাশিয়া, ইউক্রেন এবং অস্ট্রেলিয়া সহ প্রধান উৎপাদনকারী উজবেকিস্ড়ান এবং কাজাখিস্ড়ানে খরার কারণে উৎপাদন কম হওয়ায় রপ্তানি কমিয়ে দেয়। এসব কারণের সাথে প্রধান আমদানিকারক দেশসমূহ অতিরিক্ত চাহিদার চাপের ভয় একত্রিত হয়ে বিশ্ব বাজারে খাদ্যের যোগানকে আরো সংকুচিত করেছে।

৩। প্রবৃদ্ধির উপর খাদ্য মূল্যস্ফীতির প্রভাব

বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য-আয়ের দেশ হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার জন্য ইতোমধ্যে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে এবং তার সাথে সঙ্গতি রেখে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো প্রণয়ন করেছে। এসব পরিকল্পনায় ২০১১-১২ সাল থেকে ৭ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং ২০১৫-১৬ সাল থেকে ৮.২ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন করা হয়েছে। একই সাথে মূল্যস্ফীতি ৮ শতাংশের নিচে রাখা এবং ২০১৫-১৬ সালে ৫.৫ শতাংশে নামিয়ে আনার প্রাক্কলন করা হয়েছে। কিন্তু মূল্যস্ফীতির বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে তা সরকারের প্রাক্কলিত সঞ্চয় ও বিনিয়োগ হারকে বাধাগ্রস্ড় করতে পারে, যা প্রাক্কলনকৃত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বড় চ্যালেঞ্জ হবে।

মূল্যস্ফীতির কারণে সামষ্টিক অর্থনীতিতে যে প্রভাব পড়ছে তার একটি বড় উৎস হলো আন্ড়র্জাতিক বাজারে খাদ্যমূল্য ও জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের terms of trade-এ নেতিবাচক প্রভাব অর্থাৎ আমদানি মূল্যসূচকের তুলনায় রপ্তানি মূল্যসূচক কমে যাওয়া। এ কারণে বাণিজ্য ভারসাম্যের উপর প্রতিকূল প্রভাব পড়েছে। বাংলাদেশ ছাড়াও দক্ষিণ এশিয়ার সকল দেশই terms of trade এ নেতিবাচক প্রভাবের কারণে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে (চিত্র ২)।

চিত্র ২

দক্ষিণ এশিয়ার Terms of Trade-এর ক্ষতি (জানুয়ারি ২০০৩-মে ২০০৮)

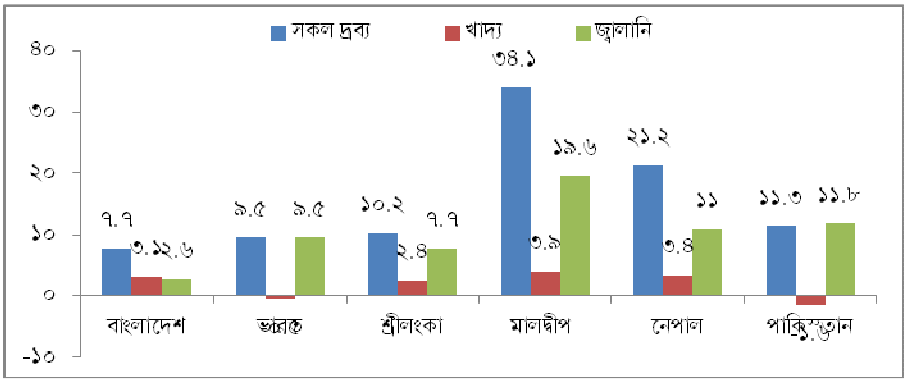

উৎস: Ahmed, Sadiq (2008)।

বাংলাদেশে ভোক্তামূল্যসূচকের তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০০০ সাল থেকে ২০০৬ পর্যন্ড় সামগ্রিক মূল্যস্ফীতির হার (১২ মাসের গড়) মোটামুটিভাবে স্থিতিশীল ছিল। কিন্তু ২০০৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ড় সামগ্রিক মুল্যস্ফীতির হার বেশ অস্থিতিশীল ছিল, যার অন্যতম কারণ হচ্ছে খাদ্যমূল্যস্ফীতির উর্ধ্বগতি। ২০০৬-২০১১ সময়কালে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির হার ৬ শতাংশের কাছাকাছি একটি স্থিতিশীল পর্যায়ে ছিল; কিন্তু খাদ্যমূল্যস্ফীতি অনেক বেশি উঠানামা করেছে। ২০০৮ সালে খাদ্যমূল্যস্ফীতি ১২ শতাংশেরও বেশি হয় এবং ২০০৯ সালে হ্রাস পেয়ে ২০০৬-২০১১

সময়কালের পর্যায়ে নেমে আসে। কিন্তু ২০১০ সালে খাদ্যমূল্যস্ফীতির হার পুনরায় বৃদ্ধি পেতে থাকে, যায় প্রভাব সামগ্রিক মূল্যস্ফীতিতে প্রতিফলিত হয় (চিত্র ৩)।

চিত্র ৩

১২ মাসের গড় মূল্যস্ফীতির হার

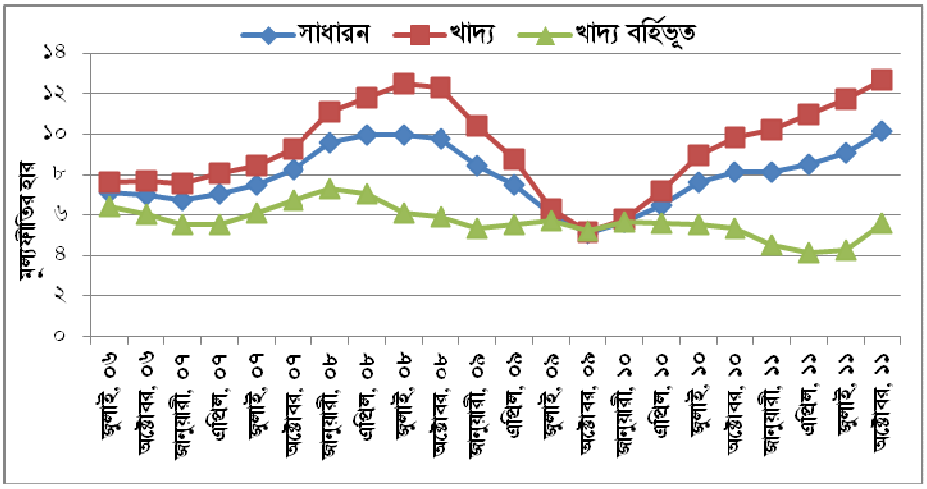

উৎস: Major Economic Indicators এর বিভিন্ন ইস্যু, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চিত্র ৪

১২ মাসের পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতির হার

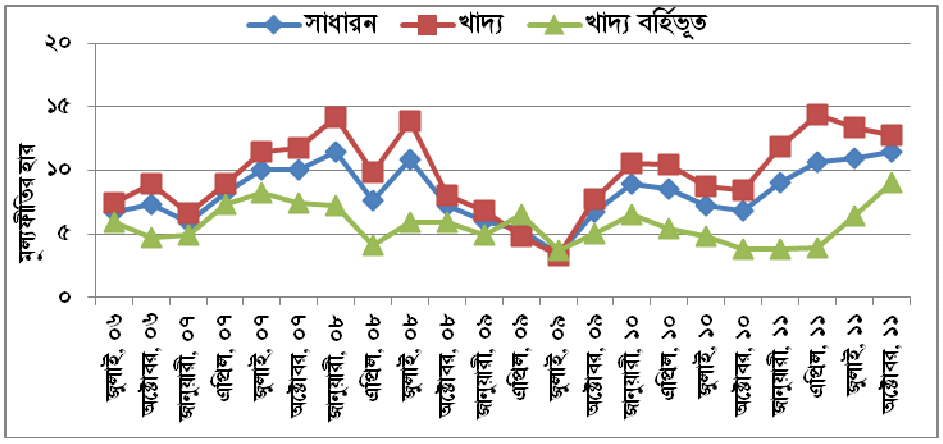

উৎস: Major Economic Indicators: Monthly update various issues, Bangladesh Bank।

আমরা যদি ১২ মাসের পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট (কোনো নির্দিষ্ট বছরের কোনো মাসের খাদ্যের মূল্য পূর্ববর্তী বছরের ঐ মাসের সাথে তুলনা করা হয়) মূল্যস্ফীতির তথ্য পর্যালোচনা করি তাহলেও দেখা যায়, সামগ্রিক ভোক্তার মূল্য সূচকের উর্ধ্বগতিতে খাদ্যমূল্যস্ফীতি প্রভাব রেখেছে (চিত্র ৪)। তাই সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন এবং সার্বিক মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে রাখতে খাদ্যমূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা জর"রি।

২০১০ সালে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত ন্যূনতম মজুরি বোর্ড কে সহায়তা করার জন্য ২০০৬ ও ২০১০ সময়ে ঢাকা শহর এবং এর আশেপাশে গার্মেন্টস কর্মীদের জীবনযাত্রার ব্যয়ের মধ্যে তুলনার জন্য একটি গবেষণা পরিচালনা করে। এই তুলনার ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান ব্যুরো থেকে ২০০৬ সালের জীবনযাত্রার ব্যয় নির্ধারণে ব্যবহৃত দ্রব্যগুচ্ছের মূল্যের তথ্য নেয়া হয় এবং ঐ একই দ্রব্যগুচ্ছের মূল্য ২০১০ সালে কত হয়েছে তা জানার জন্য মাঠ জরিপ করা হয়। উক্ত মাঠ জরিপের আওতায় ঢাকা শহরের বিভিন্ন মার্কেট যেমন: মিরপুর, সাভারসহ মোট ৪টি স্থান থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। চাল, ডাল, মাংস সহ মোট ২৮টি দ্রব্যকে এক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়েছিল এবং বিবিএস ভোক্তা মূল্যসূচক নির্ণয়ে যে ভার (weight) ব্যবহার করে তা ব্যবহার করা হয়।

সারণি ২

ভোক্তার মূল্য সূচকের পরিবর্তন, ২০০৬-২০১০

ভোক্তার মূল্য সূচক (CPI)	২০০৬ (বিবিএস)	২০১০ (বিআইডিএস)	% পরিবর্তন (মূল্যস্ফীতি)
সামগ্রিক	১৬৪.২১	২২২.৩৮	৩৫.৪২
খাদ্য	১৭০.৩৪	২৪১.৪৯	৪১.৭৭
খাদ্যবহির্ভূত	১৫৬.৫৬	১৯৭.৫৩	২৬.১৭
শহর	১৬১.৩৯	২১৭.৯৫	৩৫.০৫
গ্রাম	১৬৫.৩৭	২২৪.৫৩	৩৫.৭৭

২০১০ সালের মাঠ জরিপের তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০০৬ সালে ভোক্তার মূল্যসূচকের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায়, শুধুমাত্র চালের দাম (মধ্যম মানের) বৃদ্ধি পায় প্রায় ৫৮ শতাংশ। এই সময় মেয়াদে সামগ্রিক মূল্যস্ফীতি হয় ৩৫.৪২ শতাংশ, খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে যা ছিল ৪১.৭৭ শতাংশ এবং খাদ্যবহির্ভূত দ্রব্যের ক্ষেত্রে ২৬.১৭ শতাংশ। তবে এই সময় মেয়াদে শহরের চেয়ে গ্রামে মূল্যস্ফীতি বেশি হয়।

৪। দরিদ্র খানার উপর খাদ্যমূল্যস্ফীতির প্রভাব

খাদ্যমূল্যস্ফীতি হলে তার প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠির উপর, কারণ তারা তাদের আয়ের সিংহভাগ ব্যয় করে খাদ্যদ্রব্যের জন্য। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০০৫ অনুসারে, ৪০ শতাংশ এবং খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০ অনুসারে ৩১.৫ শতাংশ লোকের আয় দারিদ্র্যসীমার নিচে এবং তাদের উলেণ্ঢখযোগ্য অংশ খাদ্যাভাব ও অপুষ্টিতে ভোগে। Razzaque and Raihan (২০০৭)-এর গবেষণায় দেখা যায়, দেশের ৬০ শতাংশ জনগণ ক্যালরি-দরিদ্র অর্থাৎ তাদের দৈনিক ক্যালরি গ্রহণ প্রয়োজনের তুলনায় কম।

সারণি ৩

ক্যালরি দারিদ্র্য

খানার অবস্থান	ক্যালরি দারিদ্র হার(%)
গ্রাম	৫৯.৪২
শহর	৫৮.৪৫
মোট	৫৯.১২

উৎস: Razzaque and Raihan (2007)।

আভ্যন্ড়রীণ এবং আন্র্ড়জাতিক বাজারে খাদ্যদ্রব্য, বিশেষ করে চাল ও গমের মূল্যের উর্ধ্বগতি দারিদ্র্যসীমার নিচের এবং কাছাকাছি লোকদের খাদ্যনিরাপত্তা আরও ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিবে, যা অতিদরিদ্রদের কল্যাণের উপর জোরালোভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০০০ এবং ২০০৫ থেকে দেখা যায়, গড়ে খানাগুলো তাদের মোট ভোগ-ব্যয়ের ৫৪ শতাংশ ব্যয় করে খাদ্যদ্রব্যের পিছনে, যার মধ্যে গ্রামের খানাগুলো ৬০ শতাংশ এবং শহরের খানাগুলো ৪৫ শতাংশ ব্যয় করে খাদ্যদ্রব্যের জন্য। খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০-এর প্রাথমিক তথ্যমতে, এই হার ২০০৫ এর তুলনায় গ্রাম ও শহর উভয় এলাকাতেই বৃদ্ধি পেয়েছে যার পিছনে খাদ্যমূল্যবৃদ্ধির বিশেষ প্রভাব রয়েছে।

সারণি ৪

খাদ্যদ্রব্যের ব্যয় ও দরিদ্রতার প্রবণতা

(% জনসংখ্যা)

সূচক	HIES ২০১০			HIES ২০০৫			HIES ২০০০		
	মোট	গ্রাম	শহর	মোট	গ্রাম	শহর	মোট	গ্রাম	শহর
খাদ্যদ্রব্যের জন্য ব্যয়									
(% মোট ব্যয়)	-	-	-	৫২.৩১	৫৬.৮৩	৪৪.০২	৫০.৭০	৫৪.০০	৪৩.৩০
(% ভোগ-ব্যয়)	৫৪.৮১	৫৮.৭৪	৪৮.১৯	৫৩.৮১	৫৮.৫৪	৪৫.১৭	৫৪.৬০	৫৯.৩০	৪৪.৬০
DCI পদ্ধতিতে দারিদ্র্যের মাত্রা									
২১২২ কি. ক্যালরির কম	-	-	-	৪০.৪০	৩৯.৫০	৪৩.২০	৪৪.৩০	৪২.৩০	৫২.৫০
১৮০৫ কি. ক্যালরির কম	-	-	-	১৯.৫০	১৭.৯০	২৪.৪০	২০.০০	১৮.৭০	২৫.০০
CBN পদ্ধতিতে দারিদ্র্যের প্রবণতা									
নিম্ন দারিদ্র্য সীমা (%)	১৭.৬	২১.১	৭.৭	২৫.১০	২৮.৬০	১৪.৬০	৩৪.৩০	৩৭.৯০	২০.০০
উচ্চ দারিদ্র্য সীমা (%)	৩১.৫	৩৫.২	২১.৩	৪০.০০	৪৩.৮০	২৮.৪০	৪৮.৯০	৫২.৩০	৩৫.২০

উৎস: BBS: HIES various issues and HIES 2010 preliminary report।

* DCI = Direct Calorie Intake।

* CBN = Cost of Basic Needs।

প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ পদ্ধতিতে দারিদ্র্য পরিমাপে দেখা যায়, খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে কার্যত ক্যালরি গ্রহণ হ্রাস পাবে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে। CBN পদ্ধতিতে দেখা যায়, খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে দারিদ্র্যসীমার নিচের লোকদের অবস্থায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং নতুন করে আরও লোক

দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যেতে পারে। বাংলাদেশে খাদ্যদ্রব্যের (ধান বা গম) দাম বৃদ্ধির ফলে বেশির ভাগ খানাতেই নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। কোনো কারণে মজুরি সমন্বয় ব্যতীত যদি চালের দাম বৃদ্ধি পায় তবে বিভিন্ন খানার (বিশেষ করে যারা নীট চাল ভোগকারী) প্রকৃত ব্যয় গড়ে ৫ শতাংশ হারে হ্রাস পায়।

দ্রুত বা অপ্রত্যাশিত ভাবে খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির প্রভাব ভোক্তা পর্যায়ে কি পরিমাণ প্রভাব ফেলবে তা নির্ভর করে খাদ্যমূল্যবৃদ্ধি ভোক্তাদের বাজেটকে কিভাবে প্রভাবিত করবে তার উপর। স্বাভাবিকভাবে যেসকল খানার মোট আয়ের ৬০ শতাংশ বা তার বেশি ব্যয় হয় খাদ্যদ্রব্যের পিছনে, তারা খাদ্যমূল্যবৃদ্ধির ফলে বেশি ঝুঁকিতে থাকে। নিম্নআয় উপার্জনকারী মানুষ যারা তাদের বাজেটের বা মোট ভোগ ব্যয়ের একটি উলেণ্ঢখযোগ্য অংশ ব্যয় করে খাদ্যদ্রব্যের পিছনে তারাই খাদ্য মূল্যস্ফীতির কারণে বেশি প্রভাবিত হবে উচ্চ আয়ের লোকদের তুলনায়।

আমরা যদি শুধুমাত্র চালের দাম বিবেচনা করি তাহলে দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলের লোকজন তাদের মোট খাদ্যব্যয়ের ২৬.৭ শতাংশ ব্যয় করে চালের পিছনে, যেখানে শহরের লোকজন ব্যয় করে ১৭.২ শতাংশ। অন্যভাবে আয়ের দিক থেকে নিচের ২০ শতাংশ মানুষ তাদের মোট ভোগ ব্যয়ের ৩৬.১ শতাংশ এবং উপরের ২০ শতাংশ তাদের মোট ভোগ ব্যয়ের ১২.১ শতাংশ ব্যয় করেন চালের পিছনে।

সারণি ৫

চালের জন্য ব্যয় (মোট ভোগ্য ব্যয়ের প্রেক্ষিতে শতকার হার)

	মোট ব্যয়ের শতকরা হার
জাতীয়	২৪.৩
গ্রাম	২৬.৭
শহর	১৭.২
১ম কোয়াণ্টাইল (১ম ২০ শতাংশ)	৩৬.১
২য় কোয়াণ্টাইল (২য় ২০ শতাংশ)	৩০.৪
৩য় কোয়াণ্টাইল (৩য় ২০ শতাংশ)	২৫.৩
৪র্থ কোয়াণ্টাইল (৪র্থ ২০ শতাংশ)	২০.২
৫ম কোয়াণ্টাইল (৫ম ২০ শতাংশ)	১২.১

উৎস: বিশ্বনাথ এবং সিরাজুদ্দিন ২০১০।

বাংলাদেশের মানুষ খাদ্য দ্রব্যের পিছনে তাদের মোট ব্যয়ের একটি বড় অংশ ব্যয় করে; ফলে খাদ্য মূল্যে বৃদ্ধি পেলে এর প্রভাব সকলের উপরই পড়ে। খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০০৫ অনুযায়ী নিচের ৪০ শতাংশ খানা তাদের ভোগ ব্যয়ের ৩০ শতাংশের বেশি ব্যয় করে চালের পিছনে। তাই চালের মূল্য বৃদ্ধির ফলে এরাই বেশি প্রভাবিত হয়।

৫। উৎপাদনকারী ও ভোক্তা খানার উপর খাদ্যমূল্যস্ফীতির প্রভাবের ভিন্নতা

খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে খানা পর্যায়ে কি ধরনের প্রভাব পড়বে তা নির্ভর করে আলোচ্য খানা কি নীট ভোক্তা নাকি নীট উৎপাদনকারী তার উপর। মূল্যস্ফীতির প্রভাব খানাগুলোর খাদ্য উৎপাদন ও ভোগ

আচরনের উভয়ের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। খাদ্যমূল্যস্ফীতির কারণে উদ্বৃত্তকারী উৎপাদক খানাগুলোর আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন হয়, অন্যদিকে এতে ভোক্তা খানাগুলো প্রতিকূল ভাবে প্রভাবিত হয় (বিশ্বনাথ এবং সিরাজুদ্দিন ২০১০)।

চিত্র ৬
নীট উৎপাদনকারী ও নীট ভোক্তা খানার বিন্যাস ২০০৫

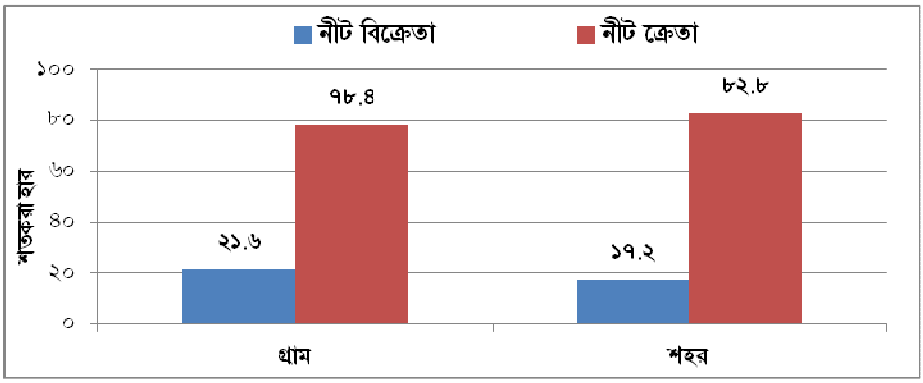

উৎস: বিশ্বনাথ এবং সিরাজুদ্দিন ২০১০।

বিশ্বনাথ এবং সিরাজুদ্দিন (২০১০) -এর গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশে গ্রাম এলাকাতে ২১.৬ শতাংশ খানা নীট বিক্রেতা এবং শহর এলাকাতে তা ১৭.২ শতাংশ। অর্থাৎ নীট ক্রেতা খানা সংখ্যা শতকরা ৭৮.৪ শতাংশ এবং শহরে এই হার ৮২.৮ শতাংশ। তাই খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে গ্রাম ও শহরের প্রায় সকল খানাই ক্ষতিগ্রস্ড় হয়, তবে শহরের খানাগুলো তুলনামূলকভাবে বেশি ক্ষতিগ্রস্ড় হবে। গ্রাম এলাকাতে নীট বিক্রেতা খানার পরিমাণ কম হওয়ার কারণ হচ্ছে গ্রামের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ খানা হয় ভূমিহীন বা প্রান্ড়িক চাষী (যাদের ০.৫ একরের নিচে জমি রয়েছে)। ভূমিহীনদের মধ্যে মাত্র ৫ শতাংশ নীট বিক্রেতা এবং কার্যকর কৃষকদের মধ্যে মাত্র ১৭ শতাংশ নীট বিক্রেতা। তবে এই ক্ষতিগ্রস্ড়দের পরিমাণ গ্রামাঞ্চলের চেয়ে শহরঞ্চলে বেশি।

৬। খাদ্যমূল্যস্ফীতি ও মজুরির হারের স্থিতিস্থাপকতা

খাদ্যমূল্যস্ফীতি যদি দীর্ঘকাল ব্যাপী চলতে থাকে তবে তার প্রভাব নির্ভর করে খানাগুলো খাদ্যমূল্যস্ফিতির প্রভাবজনিত অবস্থা কি পরিমাণে সমন্বয় করতে পারে তার উপর। খানার কল্যাণ নির্ভর করে মূল্যস্ফীতির সাথে তাদের স্ব স্ব কর্মসংস্থানের প্রকৃতি এবং তাদের মজুরির পরিবর্তনশীলতার উপর। যদি মূল্যস্ফীতির পাশাপাশি মজুরি পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করা যায় তবে মূল্যস্ফীতির প্রভাব কম হবে (Ravallin ১৯৯০)। মজুরির স্থিতিস্থাপকতা নির্ভর করে আলোচ্য খানা কোন ধরনের কর্মসংস্থানে নিয়োজিত রয়েছে তার উপর।

দরিদ্র ও কর্মজীবীদের উপর খাদ্যমূল্যস্ফীতির প্রভাব পর্যালোচনার জন্য ২০১১ সালে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ঢাকা শহরে কর্মরত রিক্সাচালক ও অদক্ষ নির্মাণ শ্রমিকদের উপর এক মাঠ জরিপ পরিচালনা করে। উক্ত মাঠ জরিপ মিরপুর-১, কাজীপাড়া, শ্যামলী, মোহাম্মদপুর, ফার্মগেট,

আগারগাঁও, মগবাজার এবং ধানমন্ডি এই আটটি এলাকায় মোট ৭৮ জন রিক্সাচালক এবং ৬৮ জন অদক্ষ নির্মাণ শ্রমিকের জানুয়ারি ২০১০ থেকে জানুয়ারি ২০১১ সময়ে ক্রয়কৃত চালের মূল্য ও তাদের দৈনিক মজুরির হিসাব নেওয়া হয়। উভয় পেশার লোকের চালের মূল্য বৃদ্ধির সাথে তাদের মজুরির বৃদ্ধিতে সক্ষম হয়েছিল, তবে তার স্থিতিস্থাপকতা ১ এর চেয়ে কম ছিল। শুধুমাত্র ৩য় ত্রৈমাসিকে তাদের মজুরি বৃদ্ধির হার মূল্য বৃদ্ধির হারের কাছাকাছি ছিল অর্থাৎ স্থিতিস্থাপকতা ১ এর কাছাকাছি ছিল।

সারণি ৬

রিক্সাচালকদের খাদ্যমূল্যস্ফীতি ও মজুরির হারের স্থিতিস্থাপকতা

ত্রৈমাসিক চিত্র	গড় মজুরি	মজুরির শতকরা পরিবর্তন	প্রতি কেজি চালের মূল্য	চালের মূল্যের শতকরা পরিবর্তন	স্থিতিস্থাপকতা
১ম ত্রৈমাসিক (জানু ২০১০)	২২০.২৬	-	২৫.৭৬	-	-
২য় ত্রৈমাসিক (জুন ২০১০)	২২৬.৭৯	২.৯৬	২৯.৯৪	১৬.২৩	০.১৮
৩য় ত্রৈমাসিক (সেপ্টেম্বর ২০১০)	২৫০.১৩	১০.২৯	৩৩.৬৫	১২.৩৯	০.৮৩
৪র্থ ত্রৈমাসিক (জানু ২০১১)	২৫৬.৭৯	২.৬৬	৪০.০৪	১৮.৯৯	০.১৪

উৎস: বিআইডিএস কর্তৃক মাঠ জরিপের উপাত্ত, ২০১১।

সারণি ৭

অদক্ষ নির্মাণ শ্রমিকদের খাদ্যমূল্যস্ফীতি ও মজুরির হারের স্থিতিস্থাপকতা

ত্রৈমাসিক চিত্র	গড় মজুরি	মজুরির শতকরা পরিবর্তন	প্রতি কেজি চালের মূল্য	চালের মূল্যের শতকরা পরিবর্তন	স্থিতিস্থাপকতা
১ম ত্রৈমাসিক (জানু ২০১০)	২৭৩.৫	-	২৫.৭	-	-
২য় ত্রৈমাসিক (জুন ২০১০)	২৮৭.৩	৫.০৩	৩০.২	১৭.৬৮	০.২৮
৩য় ত্রৈমাসিক (সেপ্টেম্বর ২০১০)	৩২১.৩	১১.৮৫	৩৩.৮	১১.৮৮	১.০০
৪র্থ ত্রৈমাসিক (জানু ২০১১)	৩২৬.২	১.৫১	৪০.৯	২১.০৯	০.০৭

উৎস: বিআইডিএস কর্তৃক মাঠ জরিপের উপাত্ত, ২০১১।

উভয় পেশার কর্মজীবিরা চালের মূল্য বৃদ্ধির সাথে তাদের মজুরি কিছুটা বৃদ্ধিতে সক্ষম হয়েছিল, তবে জানুয়ারি ২০১০ - জানুয়ারি ২০১১ সময়ে রিক্সাচালকদের ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতা ছিল ০.২৯ এবং নির্মাণ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে তা ছিল ০.৩২ অর্থাৎ ১ এর চেয়ে অনেক কম। তবে এটি লক্ষণীয় যে, রিক্সাচালকদের ক্ষেত্রে অদক্ষ নির্মাণ শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির স্থিতিস্থাপকতা বেশি। এই সময় মেয়াদে রিক্সাচালকরা গত জানুয়ারি ২০১০এ যে চাল ক্রয় করতেন সেই একই রকমের চালের মূল্য তাদের মতে ৫৫.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, সেখানে তারা মজুরি ১৬.৬ শতাংশ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে অদক্ষ নির্মাণ শ্রমিকদের মতামত অনুযায়ী তারা যে চাল ভোগ করে সেই রকম চালের দাম জানুয়ারি ২০১০ - জানুয়ারি ২০১১ সময়ে ৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায় এবং এই সময় মেয়াদে তারা তাদের মজুরি প্রায় ২০ শতাংশ বৃদ্ধিতে সক্ষম হয়। যেহেতু এই জনগোষ্ঠী তাদের মোট আয়ের ৫০ শতাংশের উপরে ব্যয় করে

খাদ্যদ্রব্যের পিছনে (যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে চাল), দাম বৃদ্ধির ফলে যদিও তারা কিছুটা মজুরি সমন্বয় করতে পেরেছিল, তারপরও ঋণাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ড় হয়।

যেসকল লোক নির্দিষ্ট বেতনে চাকরি করে যেমন: সরকারি-বেসরকারি নিবেতনের কর্মচারী, পোশাক শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকরা তাদের মজুরির স্থিতিস্থাপকতা ২০১১ তে ০ (শূন্য), কারণ ২০১০ এর পর কোনো মজুরি বৃদ্ধি পায়নি। ফলে এই মূল্যবৃদ্ধি তাদের ক্রয়ক্ষমতাকে কমিয়ে দেয়। মূল্যস্ফীতির কারণে দরিদ্র লোকদের ক্রয়ক্ষমতা উলেণ্টখ্যযোগ্য ভাবে কমে যায়। খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০০৫ এর তথ্য ব্যবহার করে বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী নিচের ২০ শতাংশ আয়ের পরিবারগুলোর ক্রয়ক্ষমতা ১০.৫ শতাংশ হ্রাস পায়, যেখানে আয়ের দিক থেকে উপরের ২০ শতাংশ খানাগুলোর ক্রয়ক্ষমতা মাত্র ১.১ শতাংশ হ্রাস পায় (বিশ্বনাথ ও সিরাজউদ্দিন ২০১০)।

২০০৮ সালের জুলাই মাসে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশে খাদ্যমূল্য সংকট নিয়ে একটি জরিপ পরিচালনা করে। উক্ত জরিপে ১২টি জেলার ২,০০০টি (যার মধ্যে গ্রাম এলাকা থেকে ১,২০০টি এবং শহর এলাকা থেকে ৮০০টি) নমুনা খানা অন্ড়র্ভুক্ত করা হয়। এই জরিপ থেকে দেখা যায়, মোট খানার ৫৩ শতাংশ ডিসেম্বর ২০০৭ হতে মার্চ ২০০৮ এই সময়ে কমপক্ষে এক মাস এক বেলা খাবার কম গ্রহণ করেছে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এ প্রবণতা আউশ ধান কাটার মৌসুম (মে মাস)-এর পরে অব্যাহত ছিল। খাদ্যমূল্য জুন পর্যন্ড় বৃদ্ধি পাচ্ছিল যার কারণে বেশির ভাগ খানা খাদ্যভোগ হ্রাস করেছিল। উক্ত গবেষণার প্রায় সকল খানা (প্রায় ৯৫ শতাংশ) খাদ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির ফলে ঋণাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ড় হয় এবং প্রায় সকলেই তা মোকাবিলা করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যার মধ্যে রয়েছে কম পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ, নিম্নমান সম্পন্ন খাদ্যে স্থানান্ড়র, খাদ্য বহির্ভূত ব্যয় হ্রাস, সঞ্চিত অর্থ উত্তোলন বা ব্যবহার, ঋণ গ্রহণ, কমিউনিটির লোকদের থেকে সহায়তা গ্রহণ, ছেলেমেয়েদের স্কুল বন্ধ করে দেয়া, শিক্ষার ব্যয় হ্রাস করা ইত্যাদি।

৭। সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ এবং ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জসমূহ

হঠাৎ খাদ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করার ক্ষেত্রে কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খানা পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সুবিধা ভোগীর সংখ্যা ২০০৫ থেকে ২০১০ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এখনও বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠী এর আওতার বাইরে রয়েছে। তাই এ কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসলে তাদের দারিদ্র্যের মাত্রা হ্রাস পাবে এবং একই সাথে খাদ্যমূলর বৃদ্ধির কারণে নেতিবাচক প্রভাব হ্রাসের ক্ষেত্রে তা ভূমিকা রাখবে।

সারণি ৮

সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে সুবিধাভোগী খানার শতকরা হার

বিভাগ	দারিদ্র্যের হার		সুবিধাভোগী খানা শতকরা হার (২০১০)			সুবিধাভোগী খানা শতকরা হার (২০০৫)		
	২০১০	২০০৫	সকল	গ্রাম	শহর	সকল	গ্রাম	শহর

জাতীয়	৩১.৫	৪০.০	২৪.৫৭	৩০.১২	৯.৪২	১৩	১৫.৫	৫.৫
ঢাকা	৩০.৫	৩২.০	১৮.৮৭	২৭.৮	৫.৯৯	১৪.৩	২০	৪.৯
বরিশাল	৩৯.৪	৫২.০	৩৪.৪৩	৩৭.২	২০.৬৬	১৩.৩	১৪.৮	৫
চট্টগ্রাম	২৬.২	৩৪.০	১৯.৯৯	২৪.৫	৭.৪৪	১১.১	১২.৯	৫.৭
খুলনা	৩২.১	৪৫.৭	৩৭.৩	৪৩.২৭	১৬.৬৬	৯.৬	১১	৪.২
রাজশাহী	২৯.৭	৫১.২	২০.৬৬	২২.৮৫	১০.১৭	১২.১	১৩	৬.৭
সিলেট	২৮.১	৩৩.৮	২৩.৫১	২৬.০৬	১০.৫০	২২.৪	২৪.৩	১১.৩
রংপুর	৪২.৩	-	৩৩.৬৫	৩৫.১১	২৩.৬৮	-	-	-

উৎস: পরিসংখ্যান ব্যুরো: HIES wewfbœ Bmy¨ (HIES 2010) প্রাথমিক রিপোর্ট mn।

পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যমতে, ২০০৫ সালের দারিদ্র্যের হার ছিল ৪০ শতাংশ এবং ঐ সময়ে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতায় সুবিধাভোগী খানার পরিমাণ ছিল ১৩ শতাংশ। খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০ সালের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী দারিদ্র্যের হার ৩১.৫ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সুবিধাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২৪.৫৭ শতাংশ হয়েছে। যদি এটি ধরে নেয়া হয় যে সকল দরিদ্রই এই কর্মসূচির আওতায় রয়েছে, তারপরও এখনো ৭-৮ শতাংশ লোক এই কর্মসূচির আওতার বাইরে রয়েছে। খাদ্য মূল্যস্ফীতি তাদের দরিদ্রাবস্থাকে আরও নাজুক করে তুলতে পারে।

বাংলাদেশে খাদ্য অনিরাপত্তায় থাকা জনসংখ্যার পরিমাণ ২০১১ সালে ৬৫.৩ মিলিয়ন, যা ২০০৮ সালে ৭.৫ থেকে ১২.৩ মিলিয়ন বৃদ্ধি পায়, যার অন্যতম প্রধান কারণ খাদ্যমূল্যের উচ্চমূল্য। এই খাদ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির ফলে অপুষ্টির শিকার জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২৭.৯ মিলিয়ন থেকে ৩৪.৭ মিলিয়নে বৃদ্ধি পায়। যার মধ্যে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে (FAO/WFP CFSAM-এর হিসেবে) প্রায় ৩০.৫ মিলিয়ন জনগোষ্ঠী সরকারের বিভিন্ন খাদ্য বিতরণ প্রকল্পের সহায়তা পেয়েছে।

সারণি ৯

খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ মোকাবিলা করার জন্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কয়েকটি গুর"ত্বপূর্ণ নিরাপত্তা কর্মসূচি

প্রকল্পের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থ (কোটি টাকা)			আওতা	উপকারিতা
	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১		
ভিজিএফ (VGF)	১৪৮৭.৫৩	১০৯৭.১৭	১৫৩৫.৯২	৭.৫ মিলিয়ন (২০০৭-০৮)	৩ মাসের জন্য ১০ কেজি চাল প্রতিমাসের জন্য
ওএমএস (OMS)	৬০০.৪৭	১০৭১.৯৬	১১৯০.৯৬	শহর এলাকা	২৪ টাকা দরে মাথাপিছু প্রতিদিন ৫ কেজি চাল
টেস্ট রিলিফ (TR)	১০২০.৪৮	৮৯৭.৮৫	৯৫৩.৮৮	৫ মিলিয়ন (২০০৮-০৯)	প্রতিদিন ৩.৫ কেজি চাল
ভিজিডি (VGD)	৭৩০.৮৫	৫৯৫.১৭	৬৩৮.৩৩	০.৭৫ মিলিয়ন	প্রতিমাসে ৩০ কেজি গম
জিআর (GR)	১৮৮.৩৪	১৬৫.২২	২২৩.৪১	৭.৫ মিলিয়ন (২০০৮-০৯)	এককালীন মাথাপিছু ১০ কেজি চাল
চট্টগ্রাম পাহাড়ী এলাকায় খাদ্য সহায়তা	২২০.৭১	১৭৭.৪৫	১৯০.৯৫	৭.৫ মিলিয়ন (২০০৮-০৯)	৩০ দিনের জন্য মাথাপিছু ৩.৫ কেজি চাল

উৎস: Rahman et al (2011)।

সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহায়তা অনেক দরিদ্র খানার খাদ্য নিরাপত্তার উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে, যেমন ব্র্যাক, CARE এবং Save the Children-US, WFP। এসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সহায়তা পায় যা মোট খাদ্য-অনিরাপত্তায় থাকা

জনগোষ্ঠীর মাত্র ১২ শতাংশ। অর্থাৎ সরকারি এবং বেসরকারি নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিগুলো খাদ্য নিরাপত্তার ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীকে এর আওতায় আনতে পারেনি।

সারণি ১০
মূল্যস্ফীতি রোধে সরকারের গৃহীত সাম্প্রতিক কিছু পদক্ষেপ

তারিখ/বছর	নীতিমালা/সিদ্ধান্ত
৩ ফেব্রুয়ারি/ ২০১০	জানুয়ারি ২০১০-এ শুরু হওয়া খোলা বাজারে চাল বিক্রির পরিধি সকল বিভাগীয় শহরে এবং তিনটি শ্রমঘন জেলা নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী এবং গাজীপুরে সম্প্রসারিত করা হয়। কেজি প্রতি চাল ২৪ টাকা দরে বিক্রি করা হয়, যা জাতীয় গড় দামের চেয়ে কম।
১১ ফেব্রুয়ারি/ ২০১০	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি-উপকরণে ভর্তুকি প্রদানের জন্য ১০৭ মিলিয়ন ডলারের প্রকল্প নেয়া হয়। এই প্রকল্পের আওতায় কৃষি-উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রদান করা হয়।
১ এপ্রিল/ ২০১০	আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের জন্য ২০১১ -এর এপ্রিলে মায়ানমার থেকে ২৫,০০০ টন চাল আমদানি করা হয়।
৩০ জুন/ ২০১০	চাল রপ্তানির নিষেধাজ্ঞা ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।
১৫ জুলাই/ ২০১০	বাজার দামে স্থিতিশীলতা আনয়নের উদ্দেশ্যে সরকার দুই মাসের মধ্যে ০.৪ মিলিয়ন টন গম আমদানির সিদ্ধান্ত নেয়।
৯ সেপ্টম্বর/ ২০১০	সরকার ভিয়েতনাম থেকে ১৫ শতাংশ ভাঙ্গা চাল (broken rice) ১ লক্ষ টন আমদানি করে এবং অতিরিক্ত ১ লক্ষ টন আমদানির চেষ্টা করেছে। এর বাইরে ভারত থেকে ৩ লক্ষ টন নন-বাসমতি চাল এবং ২ লক্ষ টন গম আমদানি করা হয়।
৩ অক্টোবর/২০১০	খোলা বাজারে বিক্রি করা চালের মূল্য ২৪ টাকা করা হয় এবং তা উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারিত করা হয়।
১ নভেম্বর/ ২০১০	সুলভ মূল্যের কার্ড প্রকল্প বন্ধ করা হয়। ১.১২ মিলিয়ন নিম্ন আয়ের কার্ডধারীকে মাসে প্রত্যেককে সর্বোচ্চ ২০ কেজি চাল ২৪ টাকা দরে ক্রয়ের অনুমতি রয়েছে।

উৎস: দৈনিক পত্রিকা।

* প্রান্তিক কৃষক যাদের জমি ০.২ হেক্টরের নিচে, ক্ষুদ্র কৃষক যাদের জমি ১ হেক্টরের নিচে এবং মাঝারি কৃষক যাদের জমি ১ থেকে ৩ হেক্টরের মধ্যে।

বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, তার উপর প্রতি বছর নগরায়ণ, শিল্পায়ন, বসতি স্থাপন, ইটের ভাটা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ইত্যাদি কারণে কৃষি জমি হ্রাস পাচ্ছে। ২০০৫ সালের ১৫৩ মিলিয়ন থেকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ২০২০ সালে ১৮৫ মিলিয়ন এবং ২০৫০ সালে ২২ মিলিয়ন হবে (জাতিসংঘ ২০০৮, আসাদুজ্জামান ২০১০)। একই সময়ে গত দুই দশকে দেশের জনগণ কৃষি জমির অনুপাতে ৪.৯ জন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭ জন হয়েছে, তার মানে ৪২-৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (আসাদুজ্জামান ২০১০)।

৮ । আলোচনা ও উপসংহার

খাদ্যদ্রব্যের দামের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বিশ্ব-সম্প্রদায়ের সাথে সাথে আলাদাভাবে দেশগুলোর জন্যও গুরুত্বপূর্ণ ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্রুত খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি এবং চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি হয়েছে যা ক্ষুধা এবং দারিদ্র্য অবস্থার অবনতি ঘটাতে পারে; তদুপরি তা সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য নানাবিধ সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাম্প্রতিককালে (২০০৬-০৮) খাদ্যমূল্যস্ফীতি গ্রাম ও শহর উভয় এলাকার জনগণের কল্যাণ ও ক্রয় ক্ষমতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, তবে এক্ষেত্রে দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ লোক বা অন্যভাবে বলতে গেলে আয়ের দিক দিয়ে নিচের

৪০ শতাংশ লোক বেশি ক্ষতিগ্রস্ড় হয়েছে। অপ্রত্যাশিত খাদ্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত নেতিবাচক প্রভাব এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দারিদ্র্য ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর উপর এদের নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করার জন্য একটি শক্তিশালী ও কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তা বলয় গড়ে তুলা উচিত। যখন রূর্যোগ আঘাত হানবে তখন এই নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো দ্র"ত সম্প্রসারিত করা হবে।

খাদ্য মূল্যস্ফীতির মাত্রা কমানোর জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে:

স্বল্পমেয়াদি পদক্ষেপ

(১) সরকারকে যেকোনো ধরনের মন্দা অবস্থা বা প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবিলা করার জন্য সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য মজুদ করতে হবে। সে লক্ষ্যে ২০০৬ সালের খাদ্যনীতি অনুযায়ী ১০ লাখ টন খাদ্য মজুদ বর্তমান সময় এবং জনসংখ্যার আলোকে সমন্বয় করা উচিত। তাছাড়া মোট উৎপাদন থেকে wastage হিসেবে যে ১২% বাদ দেয়া হয় তা যুক্তিসঙ্গত কিনা তা ভেবে দেখা দরকার। একই সাথে সরকারকে জনসংখ্যার সঠিক সংখ্যা বয়স অনুযায়ী প্রাক্কলন করে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য মজুদ নিশ্চিত করা।

(২) বাজারে প্রতিযোগিতা আনয়নের জন্য খাদ্য আমদানির ক্ষেত্রে সরকার বড় আমদানিকারকদের সাথে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আমদানিকারকদের উৎসাহিত করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে তাদের ঋণের ব্যবস্থা করে দিতে পারে। যা বাস্ড়বায়িত হলে বাজারে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। বাজারে প্রতিযোগিতা আনয়নের ক্ষেত্রে টিসিবি গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। টিসিবি (TCB) কে আরও দক্ষ ও শক্তিশালী করতে হবে, যাতে করে তারা আগাম তথ্যের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই খাদ্যের যথাযথ মজুদ গড়ে তোলে এবং সঠিক সময়ে বাজারে সরবরাহ করে। সরকার বাজারের উপর শক্তি প্রয়োগ না করে বরং এই বিকল্প ব্যবস্থায় উন্নয়ন করলে বাজার নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

(৩) সরকারের বর্তমানে চালুরত বিভিন্ন প্রকল্প কৃষি ঋণ, ডিজেল ভর্তুকি, সারের উপর ভর্তুকি, সেচের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদি প্রকল্পগুলো ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখা যেতে পারে, যা কৃষিতে বাম্পার উৎপাদনে সহায়তা করতে পারে।

(৪) সরকারকে আন্ড়র্জাতিক এবং আভ্যন্ড়রীণ বাজারে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যমূল্যের উপর নিবিড় পর্যবেক্ষণ রাখা এবং সে অনুযায়ী দ্র"ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(৫) সরকারের বিদ্যমান খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা (যেমন: খোলা বাজারে চাল বিক্রি, অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের রেশন বিক্রি ইত্যাদি প্রকল্প) প্রয়োজনের তুলনায় ছোট (১০% এর নিচে)। অতএব খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার আরও গতি আনতে হবে ও খাদ্য বিতরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। শহরের ন্যায় গ্রাম পর্যায়ে ওএমএস কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা যেতে পারে। তাছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আরও অধিক পরিমাণে খাদ্য বিতরণ করা যেতে পারে।

মধ্যমেয়াদী/দীর্ঘমেয়াদি

১. জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা যাতে কৃষি উৎপাদন হ্রাস না পায়। সে ক্ষেত্রে বন্যা প্রবণ এলাকার জন্য স্বল্পমেয়াদি শস্য বীজ উদ্ভাবন করা যাতে বন্যা আসার পূর্বেই তা সংগ্রহ করা যায়। দক্ষিণাঞ্চলের জন্য লবণাক্ততা সহনশীল বীজ উদ্ভাবন করা এবং তা যথাযথভাবে বিতরণ এবং উদ্ভাবন ও বিতরণের তথ্য প্রচার করা।

২. সরকারের খাদ্য মজুদ ও সংরক্ষণের জন্য সরকারি গুদামগুলোর ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, নতুন করে গুদামঘর নির্মাণ করা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা।

৩. কৃষি খাতে নতুন নতুন বীজ উদ্ভাবন, কৃষি সম্প্রসারণের জন্য গবেষণা পরিচালনা করা এবং আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা। কৃষি নির্ভর শিল্প গড়ে তুলতে সহায়তা প্রদান করা।

৪. কৃষকদের সমবায় গঠনে উৎসাহিত করতে হবে। এতে তারা দ্রব্য-সামগ্রীর ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে পারবে এবং একই সাথে সরবরাহ চক্রে অপ্রয়োজনীয় প্রতিনিধি কমবে। যা বাজারকে আরও স্থিতিশীল করবে। উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যায়ে যেসকল স্ড়র রয়েছে তাদের শনাক্ত করা এবং তারা কে কি পরিমাণ মুনাফা রাখছে, তা বিবেচনায় নিয়ে দেখা যে, বাড়তি খাদ্যমূল্য কারা পাচ্ছে যদি কৃষক পায় তবে কৃষি উপকরণে ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে তা হ্রাস করা যেতে পারে।

৫. গুণগত মান সম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও বিতরণ করা এবং শস্য উৎপাদনে বিভিন্নতা আনয়ন করা, যা খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

৬. বাংলাদেশে ৫০টির বেশি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি রয়েছে। এই অধিক পরিমাণে কর্মসূচি পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি করে যা অনেক সময় সঠিক লোককে প্রদান করা হয় না। তাই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সংখ্যা কমিয়ে এনে এর আওতা বৃদ্ধি করা।

গ্রন্থপঞ্জি

Ahmed, Sadiq (2008): *Global Food Price Inflation Implications for South Asia, Policy Reactions,and Future Challenges*, Policy Research Working Paper 4796, The World Bank.

Asaduzzaman, M. et.al. (2010): *Investing in Crop Agriculture in Bangladesh for Higher Growth and Productivity, and Adaptation to Climate Change*, Bangladesh Food Security Investment Forum, 26-27, Dhaka.

Bangladesh Bank (2011): *Major Economic Indicators: Monthly Update*, Volume 12/2010, December, 2010.

BBS (2005): *Household Income and Expenditure Survey-2010.*

——(2011): *Preliminary Report on Household Income and Expenditure Survey-2010.*

BIDS (2011): *Field Survey Data on Rickshaw Puller and Unskilled Construction Worker from Different areas of Dhaka City*.

Dessus, Sebastien et.al (2008): *The impact of Food Inflation on Urban Poverty and Its Monetary Cost: Some Back-of-the–Envelope Calculations*, Policy Research Working Paper 4666, The World Bank.

Dev, S. Mahendra (2010): "Food Prices in India: Trends and Policy Reactions," Working paper Policy Research Working Paper 4796, The World Bank.

Dorosh, Paul (2012): "Bangladesh-India Rice Trade, Public Stocks and Price Stabilization," Paper presented at Bangladesh Institute of Development Studies, January 26, 2012.

GIEWS (2011): *Country Brief, Bangladesh*.

Hossain, M. and Hossain, M. I (2010): *A Comparison of the Price Levels of Essential Commodities between 2006 and 2010*, Prepared for the Minimum Wage Board, Government of Bangladesh.

Hossain, Mahbub (2010): "The 2007-08 Surge in Rice Prices: The Case of Bangladesh," Policy Research Working Paper 4796, The World Bank.

Kabir (2010): *An Assessment of the Bangladesh Economy and Imperatives for Budget 2010-2011*, Pre-Budget National Seminars, CIRDAP Auditorium, Dhaka.

Khan and Wadud (2009): *Food Security and Case of Bangladesh*, Department of Agriculture Marketing, Bangladesh.

Ministry of Finance (2011): *Bangladesh Economic Review 2011.*

Schnepf, Randy and Richardson, Joe (2009): *Consumers and Food Price Inflation*, Specialist in Social Policy, Congressional Research Service 7-5700.

The Daily Star (2010 and 2011): "Several issues of 2010 and 2011".

The Financial Express (2010 and 2011): "Several issues of 2010 and 2011".

Vishwnath and Serajuddin (2010): "Welfare Impacts of Rising Food Prices in South Asian Countries," Policy Research Working Paper 4796, The World Bank.

WFP (2010): *Bangladesh Food Security Monitoring Bulletin*, Issue no. 2, Aug-Oct 2010.

World Bank (2010): *Food Price Watch,* May 2010.